কী আছে শব্দকোষে?

শব্দকোষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সম্ভবত এই যে শব্দকোষ হচ্ছে কোন ভাষার 'সবগুলো শব্দের সমষ্টি'। পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রয়েছে, যেমন, বাংলা, ইংরেজি, ফরাসি, গারো, খাসিয়া ইত্যাদি। এই ভাষাগুলো একটি অন্যটির চেয়ে আলাদা কারণ এদের ১. শব্দকোষ আলাদা, ২. ব্যাকরণও আলাদা। এখানে দুটি প্রশ্ন হতে পারেঃ ক) কোন ভাষার সবগুলো শব্দই কি সেই ভাষার শব্দকোষে লিপিবদ্ধ থাকে? বা খ)সবগুলো শব্দ শব্দকোষে লিপিবদ্ধ থাকার আদৌ কোন প্রয়োজন কি আছে? শব্দকোষে কোন শব্দ লিপিবদ্ধ থাকার অর্থ হচ্ছে শব্দটিকে সংশ্লিষ্ট বক্তা বা শ্রোতার স্মৃতিতে ধরে রাখা। এটা হয়তো কেউই অস্বীকার করবেন না যে অন্য যে কোন শক্তির মতো স্মরণশক্তিরও একটা সীমা আছে। সুতরাং এমন দাবি করা অমূলক নয় যে যদি কোন ভাষাভাষীকে তার ভাষার সব শব্দ মনে রাখতে না হয় তবে তার স্মৃতির উপর চাপ কম পড়বে। তবে এমনটা হওয়াও অসম্ভব নয় যে মানবমস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা আমরা যতটা ধারণা করছি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি, এমনকি যে কোন মানবভাষায় যত শব্দ আছে তার সবগুলোই স্মৃতিতে ধরে রাখাটা মানবমস্তিষ্কের জন্যে কোন সমস্যাই নয়।

কিন্তু এখানে সাশ্রয় বা পরিমিতির (Economy) প্রশ্ন রয়েছে। আমরা জানি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দুটি পৃথক ধারা রয়েছেঃ ১. এমপিরিসিস্ট ধারা আর ২. র‍্যাশনালিস্ট ধারা। এ্যামপিরিসিস্টদের মতটা অনেকটা এরকমঃ 'যাহা না দেখিব নিজের নয়নে, বিশ্বাস না করিব গুরুর বচনে'। কিন্তু শব্দকোষে কত শব্দ আছে তাতো এক এক কওে গোনার কোন উপায় নেই। সুতরাং র‍্যাশানালিস্ট বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই এখানে ভরসা। যা না করলেও চলে তা করা হলে র‍্যাশানালিস্ট ধারার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে অতিরিক্তি দোষ অর্শায়। এ প্রসঙ্গে চতুর্দশ দশকের দার্শনিক উইলিয়াম অব ওকামের বক্তব্য স্মর্তব্যঃ 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবে ক্ষুরের মতো, ক্ষুর যত হালকা-পাতলা হবে তার কার্যকারিতা ততই বাড়বে'। এমন কোন উপায় যদি থাকে যা দিয়ে শব্দকোষে নেই এমন শব্দও প্রয়োজনে গঠন করা যায় তবে সব শব্দ শব্দকোষে থাকার প্রয়োজন নেই। সুতরাং যত সংখ্যক শব্দ মনে না রাখলেই নয় ঠিক তত সংখ্যক শব্দ মনে রাখার নিদান দেবে যে তত্ত্ব সেই তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি হবে।

শব্দকোষে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে অন্য একটি শব্দ পাওয়া যেতে পারে। যেমন 'বন্ধুত্ব' বা 'চাঁদাবাজ' শব্দকে বিশ্লেষণ করলে আমরা 'বন্ধু' বা 'চাঁদা' এই দুটি শব্দ পাবো। প্রথাগত ব্যাকরণে 'বন্ধুত্ব' বা 'চাঁদাবাজ' এর মতো শব্দকে বলা হয় সাধিত বা যৌগিক শব্দ। 'বন্ধু' বা 'চাঁদা' মৌলিক শব্দ কারণ এগুলোকে বিশ্লেষণ করলে নতুন কোন শব্দ পাওয়া যাবে না। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে মৌলিক শব্দ যেমন, 'বন্ধু' বা 'চাঁদা' শব্দকোষে তালিকাবদ্ধ (Listed) থাকে। কিন্তু 'বন্ধুত্ব' বা 'চাঁদাবাজ' এর মতো সাধিত শব্দ শব্দকোষে থাকাটা অপরিহার্য নয়। ব্যাপারটা বিশদভাবে আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, একজন বাংলাভাষী 'বন্ধুত্ব' বা 'চাঁদাবাজ' শব্দ দুটি ভুলে গেলো। এখন কিভাবে সেই বাংলাভাষী এই শব্দ দুটি আবার মনে করতে পারবে? আমরা জানি যে 'বন্ধুত্বই' বাংলা

শব্দকোষে 'ত্ব' দিয়ে শেষ হওয়া একমাত্র শব্দ নয়, 'মনুষ্যত্ব', 'নারীত্ব' ইত্যাদি শব্দের শেষেও 'ত্ব' আছে। একইভাবে 'ধান্দাবাজ', 'ফাঁকিবাজ' ইত্যাদি শব্দের শেষে আছে একটি সাধারণ উপাদান: 'বাজ'। এই 'ত্ব' বা 'বাজ' জাতীয় উপাদানকে প্রথাগত ব্যাকরণে বলা হয় 'প্রত্যয়'। যে উপাদানটির সাথে প্রত্যয় যুক্ত হয় তার নাম প্রাতিপাদিক। 'বন্ধুত্ব', 'চাঁদাবাজ' ইত্যাদি শব্দে 'বন্ধু' আর 'চাঁদা' অংশটুকুর নাম প্রাতিপাদিক। অনেক ক্ষেত্রেই শব্দ আর প্রাতিপাদিকের মধ্যে কোন আকৃতিগত বা রূপগত (Formal) তফাৎ থাকে না কিন্তু তার মানে এই নয় যে শব্দ মানেই প্রাতিপাদিক। এ ব্যাপারে এ প্রবন্ধের ভাটিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তবে আপাতত এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে সব প্রাতিপাদিক যেমন শব্দ নয়, সব শব্দও তেমনি প্রাতিপাদিক নয়। কোন প্রাতিপাদিক বা ধাতুর (উদাহরণ: √কর + আ = করা, কর + ই = করি) সাথে প্রত্যয়, উপসর্গ, বিভক্তি (এদের সাধারণ নাম দেবো আমরা 'সর্গ') ইত্যাদি যুক্ত করাকে বলা যেতে পারে 'রূপতত্ত্ব' (Morphology)।

যে বাংলাভাষী 'বন্ধুত্ব' শব্দটি ভুলে গেছেন তিনি যদি 'ত্ব' দিয়ে শেষ হয় এমন অন্যান্য সব শব্দ, যেমন 'মনুষ্যত্ব', 'নারীত্ব' ইত্যাদি ভুলে না যান তবে তিনি এসব শব্দের আদলে 'বন্ধু' বিশেষ্যটির পরে 'ত্ব' যোগ করে 'বন্ধুত্ব' শব্দটি আবার গঠন করে নিতে পারেন। একইভাবে 'ধান্দাবাজ', 'ফাঁকিবাজ' ইত্যাদি শব্দের আদলে তিনি গঠন করে নিতে পারেন 'চাঁদাবাজ'। কিন্তু 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বা 'অঘটনঘটন-পটিয়সী'– এই দুটি শব্দ কোন বাংলাভাষী যদি ভুলে যান তবে কোন প্রকার প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগ করে তিনি সেগুলো পুনর্গঠন করতে পারবেন না। সুতরাং 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বা 'অঘটনঘটন-পটিয়সী''র মতো শব্দ অবশ্যই শব্দকোষে তালিকাবদ্ধ থাকতে হবে, কারণ কোন রূপতাত্ত্বিক নিয়ম ব্যবহার করে এই শব্দগুলো গঠন করার উপায় নেই। আমরা কিন্তু এখানে বলছি না শব্দগুলো স্মরণ করার অন্য কোন উপায়ই নেই। ধরা যাক, কোন এক বাংলাভাষী 'বন্ধু' আর 'চাঁদা'– এই দুটি শব্দ ভুলে গেল। এর পর কোন এক সময় 'বন্ধ' বা 'বন্দি' শব্দটি শুনে সেই বাংলাভাষীর 'বন্ধু' শব্দটি মনে পড়ে গেল অথবা 'আকাশের চাঁদ' বা 'জ্যামিতিবাক্সের চাঁদা' দেখে মনে পড়ে গেলো চাঁদাবাজকে দেওয়া 'চাঁদা''র কথা। কোন শব্দ স্মরণে আসার বা আনার এরকম অনেক উপায় থাকতে পাওে যেগুলো রূপতত্ত্বের আওতায় পড়ে না।

আমরা উপরে বলেছি, মৌলিক শব্দকে এমন কোন ক্ষুদ্রতর অংশে বিশ্লেষণ করা যায় না যেটি নিজেই একটি শব্দ। কিন্তু মৌলিক শব্দকে শব্দাপেক্ষা ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে – এমন দাবি করেছেন প্রাচীন ভারতের বৈয়াকরণেরা। এঁদের মতে 'ব্যাকরণ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে চারটি ক্ষুদ্রতর উপাদান: বি+আ+√কৃ>কর +অন(ট)। এখানে 'বি' আর 'আ' হচ্ছে উপসর্গ, 'কৃ' হচ্ছে ধাতু আর 'অনট' হচ্ছে প্রত্যয়। 'মনুষ্য' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে দু'টি উপাদান: 'মনু' আর 'ষ্ণ'। এখানে 'মনু' হচ্ছে প্রাতিপাদিক আর 'ষ্ণ' হচ্ছে প্রত্যয়। {অনট} বা {ষ্ণ} বাংলা ভাষার প্রত্যয় হতে পারে কি না সে প্রশ্নতো আছেই, কিন্তু তার আগে একটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা যাক: সব শব্দই কি ধাতু থেকে গঠিত হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক দার্শনিক বিতর্কের যা গত তিন হাজার বছর ধরে চলছে। এই বিতর্কে আছে দুই দল। এক দলে আছেন যাস্ক আর শাকটায়ন। এঁরা মনে করেন, বিশেষ্য থেকে শুরু করে সব ধরনের শব্দের সৃষ্টি ধাতু থেকে। যাস্কের 'নিরুক্ত' নামক গ্রন্থের নামানুসারে এঁদের বলা যেতে পারে 'নিরুক্তবাদী'। অন্য দলে রয়েছেন গার্গ্য আর পাণিনি। এঁদের মতে, সব শব্দই ধাতু থেকে সৃষ্টি– এ কথা মেনে নেয়া যায় না। যেমন, 'আম্র' বা 'বিল্ব' শুধুই নামশব্দ। কিন্তু নিরুক্তবাদীরা এ কথা মানতে রাজি হবেন না। তাঁরা বলবেন, ওমুক ধাতুর সাথে ওমুক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এই বিশেষ ফলদ্যোতক শব্দ দু'টি নিষ্পন্ন হয়েছে। পাণিনি যদি বলেন, এ রকম ধাতু আর প্রত্যয় সংস্কৃতে নেই তাহলেও নিরুক্তবাদীরা সহজে মেনে নেবেন না সে কথা। চটজলদি নতুন ধাতু (যেমন ধরুন, *√ম্র বা *√বিল) বা উপসর্গ/প্রত্যয় (আ+√ম্র+অ অথবা √বিল+অ) কল্পনা করে নিয়ে সেগুলোকে ধাতু, উপসর্গ ও প্রত্যয়-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানাবেন তাঁরা। সম্ভব হলে কৃতঋণ তুর্কি শব্দ 'মোল্লা'-কেও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করবেন তাঁরা এই বলে যে √মা ধাতুর সাথে (কাল্পনিক) 'ডোল্লা' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'মোল্লা' শব্দটির সৃষ্টি। এ ব্যাকরণধারার অনুসারীদের মত সম্ভবত এই হতে পারে যে শব্দকোষে থাকবে ধাতু, উপসর্গ, অঙ্গ, প্রাতিপাদিক, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি, কিন্তু পূর্ণ (সাধিত) শব্দ সেখানে থাকার প্রয়োজন নেই। পাণিনির মতে অবশ্য কিছু কিছু শব্দ/প্রাতিপাদিক শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। পাণিনির ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর সাথে দুটি সংযুক্তি (Appendix) আছেঃ ধাতুপাঠ ও গণপাঠ। গণপাঠ প্রাতিপাদিকগুলোর একটি তালিকা, ধাতুপাঠ ধাতুগুলোর একটি তালিকা।

ফার্দিনঁ দ্য সসুর (১৯১৫) আর ব্লুমফিল্ড (১৯৩৩:২৭৪) মনে করতেন, শব্দকোষ হচ্ছে যাবতীয় অনিয়মিত (অর্থাৎ ব্যাকরণের সূত্র দিয়ে নাগাল পাওয়া যায় না এমন সব) ভাষিক বস্তুর একটি তালিকা। এই দুই দিকপাল ভাষাবিজ্ঞানীর মতে শব্দকোষ ব্যাকরণের অংশ নয়, একটি সংযুক্তি মাত্র। চমস্কি (১৯৫৭) মনে করেন, শব্দকোষে এমন সব মৌলিক শব্দ থাকবে যেগুলো **প্রাতিস্বিক** (Idiosyncratic) ও **আর্বিত্রিক** (Arbitrary)। কোন উপাদানে **প্রাতিস্বিকতা** (Idiosyncrasy) থাকার মানে হচ্ছে সেই উপাদানটির এমন কিছু উদ্ভট/বিরল বৈশিষ্ট্য থাকবে যা শুধু সেই উপাদানটিরই আছে এবং ব্যাকরণের কোন সূত্র দিয়ে এই সব বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। রূপতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন উপাদান প্রাতিস্বিক হবার মানে হচ্ছে এই যে রূপতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সব উপাদানের গঠন ব্যাখ্যা করা যাবে না। যেমন 'চাঁদা', 'বন্ধু' ও 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়'... এই সব শব্দের গঠন রূপতত্ত্বেও কোন সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে এখানে একটি কথা আছে। কেউ বলতে পারেন, প্রাতিপাদিক 'চাঁদ' এর সাথে আ প্রত্যয়, প্রাতিপাদিক 'বন্ধ' এর সাথে উ প্রত্যয় যুক্ত করে 'চাঁদা' আর 'বন্ধু' শব্দ গঠিত হতে পারে। কিন্তু আকাশের 'চাঁদ' এর সাথে 'চাঁদা'র বা 'বন্ধ' এর সাথে 'বন্ধু'র কোন সম্পর্ক নেই। কোন রূপতাত্ত্বিক সূত্রের যোগান (Input) (যেমন, চাঁদ, বন্ধ) আর উৎপাদনের (Output) (যেমন, চাঁদা, বন্ধু) মধ্যে অর্থগত সম্পর্ক থাকতে হবে।

চমস্কি (১৯৫৭) এর মতে শব্দকোষের প্রতিটি ভুক্তি একটি বৈন্যাসিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কোনটি বিশেষ্য, কোনটি ক্রিয়া, কোনটি অনুসর্গ, কোনটি বা বিশেষণ। এই শ্রেণীগুলোকে

আমরা বলবো 'পদ'। প্রতিটি ভুক্তির বেশ কিছু পদীয় বৈশিষ্ট্য (Categorical features) রয়েছে। যেমন, যে ভুক্তিটি বিশেষ্য সেটি ক্রিয়ার কর্তা বা কর্ম হতে পারে, কিন্তু যে ভুক্তিটি অনুসর্গ সেটি তা পারে না। এছাড়া এদের থাকবে কিছু উপপদীয় বৈশিষ্ট্য (Subcategorical features), যেমন, কোন বিশেষ্য হতে পারে জাতিবাচক, কোনটি বস্তুবাচক, কোন ক্রিয়া হতে পারে সকর্মক বা অকর্মক। কোন বিশেষ ভুক্তি অন্য কিছু বিশেষ ভুক্তির সাথে জোট বাঁধতে বাধ্য; আবার কোন কোন বিশেষ ভুক্তি অন্য কিছু বিশেষ ভুক্তির সাথে জোট বাঁধতে পারে না। এর মানে হচ্ছে, শব্দকোষের প্রতিটি ভুক্তির কিছু **নির্বাচনী বাধ্যবাধকতা** (Selectional restriction) থাকবে। এই বাধ্যবাধকতাগুলো বাক্যতাত্ত্বিক বা বৈন্যাসিক (Syntactic) হতে পারে, আবার অর্থতাত্ত্বিকও (Semantic) হতে পারে। নিচের ১নং বাক্যটি গ্রহণযোগ্য কিন্তু ২নং বাক্যটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ 'নেওয়া' ক্রিয়ার উপপদীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এর একটি পূরক থাকতে হবে এবং পূরকটি হবে একটি বিশেষ্য (শার্ট)। ৩নং বাক্যটির গ্রহণযোগ্যতা নেই কারণ 'নেওয়া' ক্রিয়ার সাথে ক্রিয়াবিশেষণ 'তীব্রভাবে' জোট বাঁধতে পারে না। ৪নং বাক্যটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে কারণ বাস্তব জগতে 'বই' বস্তুটি মানুষ 'ঋক'-কে ভালোবাসতে পারে না বা বস্তু 'বই' ভালোবাসা বিধেয় বা ক্রিয়ার হোতা (Agent) (অর্থাৎ 'পড়ার কাজটি যে করে') হতে পারে না।

(১) সামসু ঈদে একটি শার্ট নেবে।
(২) *সামসু ঈদে নেবে।
(৩) *সামসু ঈদে তীব্রভাবে শার্ট নেবে।
(৪) *বই ঋককে ভালোবাসে।

৫ নং উদাহরণে চাওয়া ক্রিয়াপদটির সাথে ক্রিয়াবিশেষণ 'আন্তরিকভাবে' ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু ৬নং উদাহরণে ক্রিয়াবিশেষণ ছাড়াও বাক্যটি গ্রহণযোগ্য রয়েছে। আবার ৩নং উদাহরণে ক্রিয়াবিশেষণ 'তীব্রভাবে' ব্যবহার করার কারণে বাক্যটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। এর মানে হচ্ছে, কোন বিশেষ ক্রিয়াবিশেষণ গ্রহণ করে এমন কোন ক্রিয়াপদ ঐ ক্রিয়াবিশেষণ গ্রহণ করে না এমন ক্রিয়াপদে পরিণত হতে পারে। কিন্তু (সাধারণত) কোন বিশেষ ক্রিয়াবিশেষণ গ্রহণ করে না এমন কোন ক্রিয়াপদ ঐ ক্রিয়াবিশেষণ গ্রহণ করে এমন ক্রিয়াপদে পরিণত হতে পারে না। সুতরাং শব্দকোষে থাকবে অনেকটা (৭) এর মতো আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র। প্রশ্ন হতে পারে, এ ধরণের সূত্রের প্রয়োজনটা কি? প্রয়োজন এই যে যদি এই সব সূত্র না থাকে তবে 'চাওয়া' ক্রিয়াপদের দুটি ভুক্তি দিতে হবে শব্দকোষে: চাওয়া-১ [+ — ক্রিয়াবিশেষণ] এবং চাওয়া-২ [+ — ∅] (এখানে ∅ চিহ্নের অর্থ শূন্য)। এর মানে হচ্ছে, শব্দকোষে দুটি আলাদা 'চাওয়া' থাকবে, প্রথমটির সাথে ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহৃত হবে, দ্বিতীয়টির সাথে হবে না। (৭) এর উপস্থিতিতে 'চাওয়া' ক্রিয়ার একটি মাত্র ভুক্তি দিয়ে কাজ চলে যাবে এবং এতে করে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে পরিমিতির যে শর্ত আছে তাও লঙ্ঘিত হবে না।

(৫) বাঙালিরা আন্তরিকভাবে শান্তি চায়।
(৬) বাঙালিরা শান্তি চায়।
(৭) [+ — ক্রিয়াবিশেষণ] → [+ — ∅]

চমস্কি (১৯৬৫) মডেল অনুসারে শব্দকোষে 'পটল তোলা' বা 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' এর মতো বাগধারা ও 'দেখে নেওয়া' এর মতো বাগবিধিও তালিকাবদ্ধ থাকে। যদিও প্রতিটি বাগধারা বা বাগবিধি একাধিক শব্দের সমষ্টি, তবুও চমস্কি এ ধরণের ভাষিক উপাদানগুলোকে কোন শব্দের মতো একক ভুক্তি বলে বিবেচনা করার পক্ষপাতী। এই মডেল অনুসারে শব্দকোষে কোন প্রত্যয়ান্ত বা সমাসান্ত শব্দ থাকবে না, কারণ রূপান্তর সূত্র দিয়ে এ ধরণের শব্দ গঠন করা সম্ভব। বিশেষ্য 'ধারণ' আর বিশেষণ 'ধৃত' এর জন্যে আলাদা ভুক্তির প্রয়োজন নেই এই মডেলে। রূপান্তর সূত্রের মাধ্যমে 'ধরা' ক্রিয়াপদ (বা √ধৃ বা √ধর ধাতু) থেকে বিশেষ্য 'ধারণ' আর বিশেষণ 'ধৃত' গঠন করা সম্ভব। প্রশ্ন হতে পারে, বিশেষ্য 'ক্রোধ' আর বিশেষণ 'ক্রুদ্ধ' গঠন করা হবে কোন ক্রিয়া বা ধাতু থেকে। সংস্কৃতে √ক্রুধ ধাতু আছে কিন্তু বাংলায় *ক্রোধা ('ধরা"র অনুকরণে) বলে কোন ক্রিয়া নেই। চমস্কি (১৯৭০) প্রবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ধারণ' ও 'ধৃত' রূপান্তর সূত্রের মাধ্যমে গঠিত হবে না। শব্দ দুটি তালিকাবদ্ধ থাকবে শব্দকোষে কিন্তু তাদের থাকবে একটি মাত্র ভুক্তি: ধর$_{\text{বিশেষ্য/বিশেষণ/ক্রিয়া}}$। এই ভুক্তিটি বাক্যে ব্যবহারের প্রয়োজনে কখনো 'ধারণ' কখনো 'ধরা' বা কখনো 'ধৃত' হিসেবে 'স্ফুরিত' (Spelled) হবে। একইভাবে ক্রোধ$_{\text{বিশেষ্য/বিশেষণ}}$ ভুক্তিটি স্ফুরিত হবে কখনও 'ক্রোধ', কখনওবা 'ক্রুদ্ধ' হিসেবে। কিন্তু 'ধারণা' শব্দটি গঠিত হবে কি 'ধরা' থেকে নাকি 'ধারণ' থেকে? 'ধারণা' শব্দ গঠনের জন্যে 'ধরা' আর 'ধারণা"র মধ্যে এই যে প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগিতা তা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? চমস্কি (১৯৭০) প্রবন্ধে এ ধরনের প্রশ্নের কোন উত্তর দেয়া হয়নি বলেই আমার ধারণা।

মরিস হালে (১৯৭৩) প্রস্তাবিত রূপতাত্ত্বিক মডেলে শব্দকোষে আছে তিন তিনটি তালিকা। প্রথম তালিকায় আছে শুধু রূপমূল অর্থাৎ বিশ্লেষণ করা যায় না এমন সব মৌলিক শব্দ (যেমন, 'বই', 'কলম'), অঙ্গ (Stem) (যেমন, 'প্রণাম' এর {ণাম}, 'প্রভাত' এর {ভাত}) আর যাবতীয় উপসর্গ (যেমন প্র, পরা ইত্যাদি), প্রত্যয় ('বন্ধুত্ব' এর {ত্ব}) ও বিভক্তি ('করি' এর {ই}); দ্বিতীয় তালিকাটি হচ্ছে একটি অভিধান যাতে আছে ভাষায় ব্যবহৃত হয় এমন সব শব্দ। আর তৃতীয় তালিকাটি হচ্ছে একটি ছাঁকুনি যাতে নবগঠিত এমন সব শব্দ আটকা পড়ে যেগুলো কখনই কোন বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। ধরুন, শব্দনির্মাণ সূত্র ব্যবহার করে 'বন্ধু' আর 'শত্রু' প্রাতিপাদিকের সাথে {ত্ব} প্রত্যয় যুক্ত করে গঠিত হলো 'বন্ধুত্ব' আর 'শত্রুত্ব' এই দুটি শব্দ। উপসর্গ {প্র} আর অঙ্গ {ণাম} যুক্ত হয়ে গঠিত হলো 'প্রণাম'। এর পর এই সব শব্দ গিয়ে ঢুকবে ছাঁকুনিতে। ঢুকবে সব নবগঠিত শব্দ কিন্তু বের হতে পারবে না সবগুলো। ছাঁকুনি থেকে বের হবে 'বন্ধুত্ব' আর 'প্রণাম' এবং তারপর শব্দ দুটি অভিধানে স্থান পাবে। 'শত্রুত্ব' ছাঁকুনিতেই আটকে থাকবে কারণ এই শব্দটি বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত হয় না।

'শত্রুত্ব' আর 'বন্ধুত্ব' এই উভয় শব্দই শব্দকোষের অংশ, তবে এদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে প্রথমটি বাক্যে ব্যবহৃত হয় না, পরেরটি ব্যবহৃত হয়। বাক্যে ব্যবহৃত হয় না এমন শব্দকে হালের মডেলে একটি বিশেষ স্বলক্ষণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে: [–Lexical insertion] যাকে আমরা বাংলায় [– বাক্যপ্রায়োগিক] (অর্থাৎ বাক্যে ব্যবহার-অনুপযোগী) বলতে পারি। হালের মত অনুসরণ করলে বলতে হবে যে কোন বাংলাভাষী 'শত্রুত্ব' আর 'বন্ধুত্ব' এই উভয় শব্দই জানে এবং সে এও জানে যে 'শত্রুত্ব' শব্দটি বাক্যে প্রয়োগ করা যায় না।

থিও ফেনোমেন (১৯৭৪) বিবিধ ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক যুক্তিসহকারে দাবি করেছেন যে শব্দকোষে ধাতু, অঙ্গ এবং বিভিন্ন প্রকার 'সর্গ' (প্রত্যয়, উপসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি) থাকার প্রয়োজন নেই। শব্দকোষে থাকবে শব্দ এবং অবশ্যই শব্দের চেয়ে বৃহত্তর কিছু বস্তু যেমন বাগধারা বা বাগবিধি (Idioms), মুখস্ত করা বা স্মৃতিতে থাকা কোন পরিচ্ছেদ বা কবিতা, রূপকথা, কিন্তু শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন বস্তু কোনমতেই নয়। কিসের ভিত্তিতে ফেনোমেন এ রকম দাবি করছেন? একটি উদাহরণ দেয়া যাক। 'বাঘ' শব্দটি যদিও 'ঘ' বানানে লেখা হয় এর উচ্চারণ আসলে 'বাগ' অর্থাৎ উচ্চারণের সময় শব্দের শেষের 'ঘ' এর মহাপ্রাণতা বজায় থাকে না। কিন্তু 'বাঘের' বা 'বাঘা' শব্দ উচ্চারণের সময় 'ঘ' এর মহাপ্রাণতা বজায় থাকে (অর্থাৎ 'বাগের' বা 'বাগা' উচ্চারণ গ্রহণযোগ্য নয়)। অন্যভাবে বলা যায়, কোন অক্ষরের উপধায় (Coda) যদি মহাপ্রাণ প্রণব (ধ্বনিমূল) থাকে এবং সেই অক্ষর দিয়ে যদি কোন শব্দ শেষ হয় তবে সেই মহাপ্রাণ প্রণবটি অল্পপ্রাণ প্রণব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। লক্ষ্য করুন, ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়মটি প্রযুক্ত হচ্ছে দুটি এককে: অক্ষর ও শব্দে। রূপমূলের অন্তে এই নিয়মটি প্রযুক্ত হচ্ছে না কারণ 'বাঘের' ({বাঘ}+ {এর}) বা 'বাঘা' ({বাঘ} + {আ}) শব্দে 'বাঘ' রূপমূলে (অর্থাৎ, এক্ষেত্রে প্রাতিপাদিকে) 'ঘ' এর মহাপ্রাণতা বজায় থাকছে। সুতরাং উপধায় মহাপ্রাণতালোপের ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মটি রূপমূল বা প্রাতিপাদিকের মতো বস্তুগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যেই নিচ্ছে না এবং এর ফলে রূপমূলকে বাদ দিয়েই শব্দের অন্তর্লীণ কাঠামো থেকে ভূমিকাঠামোতে উত্তরণের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। সুতরাং রূপমূল, প্রাতিপাদিক বা প্রত্যয়ের মতো এককগুলো শব্দকোষে রাখাটা কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ফেনোমেনের মতে ভাষাবর্ণনা, ভাষাশিক্ষণ বা ভাষাশিক্ষাদানের জন্যে বৈয়াকরণেরা ধাতু, প্রত্যয়, বিভক্তি, রূপমূল... এই সব বস্তু কল্পনা করেছেন। বাস্তবে এসব বস্তুর অস্তিত্বও নেই, রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় এগুলো অপরিহার্যও নয়।

জ্যাকেন্ডফ (১৯৭৫) দাবি করেন যে শব্দকোষে একটি মাত্র তালিকা আছে এবং সেই তালিকায় আছে শুধু পূর্ণ শব্দ। এই শব্দগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই একটি অন্যটির সাথে Lexical Redundancy Rule (যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি 'আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র') দ্বারা যুক্ত। শব্দকোষের অনেক শব্দই অন্য একটি শব্দের সাথে অর্থগত ও রূপগতভাবে সম্পর্কিত থাকে। যেমন, অনুষ্ঠান ↔ অনুষ্ঠিত। এখানে [/X+ আন/+বিশেষ্য] শব্দটি [/X+ ইত/+বিশেষণ] শব্দের সাথে যুক্ত। এই সূত্রে [+বিশেষ্য] বা {+বিশেষণ} যথাক্রমে 'অনুষ্ঠান' ও 'অনুষ্ঠিত' শব্দের পদগত স্বলক্ষণ। যেহেতু 'অনুষ্ঠান' ও 'অনুষ্ঠিত' শব্দদ্বয়ের মধ্যে একই অঙ্গ (Stem) {অনুষ্ঠ} ব্যবহৃত হয়েছে সেহেতু এই দুটি

শব্দের মধ্যে রূপগত সম্পর্ক রয়েছে। এদের মধ্যে অর্থগত সম্পর্কও রয়েছে: 'যা 'অনুষ্ঠিত হয়েছে' তাই 'অনুষ্ঠান")। জ্যাকেন্ডফের মতে আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র রচনার জন্যে দুটি শব্দের মধ্যে রূপগত এবং অর্থগত/আর্থ (Semantic) এই উভয় প্রকার সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। শুধু রূপগত ব কেবলমাত্র আর্থ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে আভিধানিক পৌনপুনিকতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যেমন, 'প্রতিষ্ঠান' আর 'প্রতিষ্ঠিত' (কোন 'প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি' এই অর্থে) রূপগত ভাবে সম্পর্কিত কিন্তু এ দুটি শব্দের মধ্যে আর্থ সম্পর্ক নেই। 'কবি' ও 'কবিয়াল' আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র দ্বারা সম্পর্কিত কারণ এই দুই শব্দের মধ্যে রূপগত ও অর্থগত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু যদিও 'ঘড়ি' শব্দের সাথে 'ঘড়িয়াল' (কুমিরের প্রজাতি) শব্দের রূপগত সম্পর্ক দেখানো সম্ভব, এ শব্দ দুটির মধ্যে কোন অর্থগত সম্পর্ক নেই। সুতরাং 'ঘড়ি' ও 'ঘড়িয়াল' বাংলা শব্দকোষে দুটি স্বাধীন ভুক্তি হয়ে থাকবে।

'অনুষ্ঠান/অনুষ্টিত' এর সাথে মিলিয়ে 'প্রস্থান' থেকে *'প্রস্থিত' শব্দটি গঠন করা যায় কিন্তু জ্যাকেন্ডফের মডেল অনুসারে এই শব্দটি শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত হবে না। দেখা যাচ্ছে, কোন একটি শব্দ আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র দ্বারা গঠিত হতে পারাটাই যথেষ্ট নয়, শব্দটি শব্দকোষের অন্তর্ভুক্তও হতে হবে। 'শাসন' ও 'রাজা' অর্থগতভাবে সম্পর্কিত কিন্তু এদের মধ্যে রূপগত সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে 'শাসন' ও 'শাসক' রূপগত ও অর্থগতভাবে সম্পর্কিত। 'রাজা' ও 'প্রতিষ্ঠিত' এর মতো শব্দগুলো জ্যাকেন্ডফের মডেল অনুসারে শব্দকোষে স্বাধীনভাবে তালিকাভুক্ত। তবে 'রাজা' আর 'প্রতিষ্ঠিত' এই দুই জাতীয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'প্রতিষ্ঠিত' এর সাথে 'অনুষ্ঠিত' শব্দের রূপগত মিলের কারণে এর অর্থ কি হতে পারে তা কিছুটা হলেও ধারণা করা যায়, যা 'রাজা' শব্দের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। জ্যাকেন্ডফের মতে কোন শব্দকে স্বাধীন ভুক্তি ('ঘড়িয়াল', 'রাজা') হিসেবে দেখানোর চাইতে আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্রে আবদ্ধ হিসেবে দেখানো তত্ত্বরচনার দিক থেকে অনেক সাশ্রয়কর। 'অনুষ্ঠিত', 'অধিষ্ঠিত', ইত্যাদি অনেক শব্দের রূপগত ও অর্থগত কাঠামোর বেশির ভাগ তথ্য আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্রেই দেয়া থাকে (এর ফলে হয়তো স্মৃতির উপরও চাপ কম পড়ে)। অন্যদিকে 'রাজা' বা 'ঘড়িয়াল' জাতীয় শব্দের রূপগত ও অর্থগত সব তথ্য আলাদা আলাদাভাবে মনে রাখতে হয়।

'প্রগতি', 'প্রয়োগ' ইত্যাদি শব্দও আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র দিয়ে গঠন করা যায় না। এই শব্দগুলোর সাথে 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দের পার্থক্য এই যে 'প্রতিষ্ঠিত' শব্দটিকে অন্য একটি আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্রের (অনুষ্ঠান/অনুষ্ঠিত) সাথে অন্তত রূপগতভাবে সম্পর্কিত করা যায়, কিন্তু 'প্রয়োগ' বা 'প্রগতি' এর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। জ্যাকেন্ডফের মডেল অনুসারে {প্র} জাতীয় উপসর্গকে শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে দেখানো যায় আবার বিশেষ ধরণের আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্রেরও অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সূত্রগুলো একটু 'বিশেষ ধরণের' বললাম এ কারণে যে এসব সূত্রের মাধ্যমে দুটি পূর্ণ শব্দ নয় বরং একটি উপসর্গ {প্র} এবং একটি অঙ্গ {য়োগ} বা প্রাতিপাদিকের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়:{প্র, পরা, অপ}+{য়োগ, গতি, ভব, রাধ}$_{+\text{বিশেষ্য}}$ = (যথাক্রমে) /প্রয়োগ/, /প্রগতি, /পরাভব/, /অপরাধ/}$_{+\text{বিশেষ্য}}$। এই উপসর্গগুলোকে শব্দকোষের অংশ করা আর আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা

জ্যাকেন্ডফের মতে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। 'রাজা' শব্দের সাথে 'প্রয়োগ' বা 'প্রগতি' এর পার্থক্য আছে। আমরা উপওে দেখেছি, 'প্রয়োগ' বা 'প্রগতি' জাতীয় শব্দগুলো এক বিশেষ ধরণের আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র দিয়ে গাঁথা। 'রাজা'-শব্দটিকে এ রকম কোন সূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। সম্ভব হতো যদি বাংলা শব্দকোষে *'রাজন' (বা *'রাজানো') বলে একটি ক্রিয়া থাকতো এবং তার অর্থ হতো 'রাজত্ব করা'। 'প্রয়োগ/প্রগতি"র সাথে 'শত্রুত্ব' জাতীয় শব্দেরও পার্থক্য রয়েছে। *'শত্রুত্ব' শব্দকোষের অংশ নয় কিন্তু 'প্রয়োগ/প্রগতি' শব্দকোষে তালিকাভুক্ত।

ফেনোমেনের শব্দকোষের সাথে জ্যাকেন্ডফের শব্দকোষের দুটি মিল রয়েছে: ১. এতে শব্দের চেয়ে বৃহত্তর উপাদান যেমন বাগধারা বা বাগবিধি থাকতে পারে, এবং ২. শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন উপাদান এই দুটি মডেল অনুসারে শব্দকোষের অংশ নয়, আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্রের অংশ। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে মরিস হালের শব্দকোষের সাথে জ্যাকেন্ডফের শব্দকোষের তিনটি পার্থক্য আছে: ১. 'শত্রুত্ব' শব্দটি এখানে শব্দকোষের অংশ হবে না; ২. ছাঁকুনির কোন ব্যাপার নেই আর ৩. শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্রতর উপাদানগুলো আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্রের অন্তর্ভুক্ত, শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমরা দেখেছি, হালের শব্দকোষে *'শত্রুত্ব' বা *'প্রস্থিত' জাতীয় শব্দগুলো অভিধানের অংশ কিন্তু অভিধান যেহেতু শব্দকোষের অংশ সেহেতু বাক্যে ব্যবহৃত না হলেও এ শব্দগুলো ছাঁকুনিতে আটকে শব্দকোষে থেকেই যায় অর্থাৎ বাংলাভাষীকে এ শব্দগুলো মনে রাখতে হয়। কিন্তু যা আমি কখনই কোন বাক্যে ব্যবহার করতে পারবো না তা শুধু শুধু আমার শব্দকোষে থাকবেই বা কেন! হালের [– Lexical insertion] বা [– বাক্যপ্রায়োগিক] স্বলক্ষণটি জ্যাকেন্ডফের মতে একটি উটকো ঝামেলা এবং জাকেন্ডফ যে কোন মূল্যে এটি পরিহার করতে চান। এ কারণে তিনি *'শত্রুত্ব' আর *'প্রস্থিত' জাতীয় শব্দগুলোকে শব্দকোষ থেকে বাদ দেবার পক্ষে।

আরোনফ (১৯৭৬) এর মতে প্রত্যয়, উপসর্গ জাতীয় উপাদানগুলো শব্দগঠন সূত্রের অংশ, শব্দকোষে এসব উপাদান নেই। শব্দগঠন সূত্র দিয়ে শব্দ গঠনের সময় এই উপাদানগুলো যোগান-শব্দের (ইনপুট) সাথে যুক্ত হয়। শব্দগঠন সূত্রের উদাহরণ:

(৮) 'বন্ধু' → বন্ধু + {ত্ব}= 'বন্ধুত্ব';
(৯) 'নায়ক' → {অধি} + নায়ক = 'অধিনায়ক';
(১০) 'সাঁতরা' → সাঁতরা + {ই} = 'সাঁতরাই'।

আরোনফ (১৯৭৬) দাবি করেছিলেন যে শব্দকোষে শব্দগঠন সূত্রের যোগান ('বন্ধু', 'সাঁতরা') ও উৎপাদন ('বন্ধুত্ব', 'সাঁতরাই') উভয়ই হবে এক একটি শব্দ। কিন্তু পরবর্তী কালের রচনায় (১৯৯২) তিনি তাঁর এই বক্তব্য সংশোধন করে বলেছেন: শব্দ নয়, শব্দগঠনসূত্রের যোগান হবে 'অঙ্গ' (Stem)। 'বন্ধু', 'নায়ক', 'সাঁতরা' এই সবই এক একটি অঙ্গ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আরোনফের 'অঙ্গ'-কে প্রাতিপাদিক বা শব্দও বলা যেতে পাওে বটে, কিন্তু কোন কোন অঙ্গ (যেমন 'সাঁতরা' বা 'আছড়া') প্রাতিপাদিক নয় যদি 'প্রাতিপাদিক' বলতে আমরা শুধুই মৌলিক

শব্দ বুঝি। 'সাঁতার' ও 'আছাড়' প্রাতিপাদিকের সাথে {আ} প্রত্যয় যুক্ত করে এগুলোকে অঙ্গে পরিণত করা হয়। তবে শব্দ আর অঙ্গকে এক বলে মনে হয় শুধু বাংলা বা ইংরেজির মতো ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষাগুলোতে। সেমিটিক ভাষা আরবি বা হিব্রুতে শব্দ আর অঙ্গ আলাদা দুটি বস্তু। যেমন, আরবি {ক-ত-ব} একটি অঙ্গ কিন্তু এই অঙ্গ দিয়ে গঠিত 'কিতাব' বা 'কুতুব' হচ্ছে শব্দ। একই ভাবে হিব্রু {হ-গ-দ-ল} একটি অঙ্গ আর এই অঙ্গ দিয়ে গঠিত 'হাগদালা' (যার অর্থ 'টাওয়ার' বা 'বুরুজ') একটি শব্দ। আরোনফের মডেল অনুসারে শব্দগঠন সূত্র দিয়ে গঠন করা যায় না এমন সব শব্দ (যেমন, 'রাজা', 'ঘড়িয়াল', 'প্রভাব') এবং যাবতীয় অঙ্গ শব্দকোষের অংশ।

আরোনফের সাথে জ্যাকেন্ডফের শব্দকোষের তফাৎ কোথায়? সব পূর্ণ শব্দ জ্যাকেন্ডফের শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত। আরোনফের শব্দকোষে শুধু সেই শব্দগুলোই থাকবে যেগুলো শব্দগঠন সূত্র দ্বারা গঠন করা সম্ভব নয়। যেমন 'বন্ধুত্ব' ও 'প্রতিষ্ঠান' শব্দ দুটি জ্যাকেন্ডফের মডেল অনুসারে শব্দকোষে থাকবে, কিন্তু আরোনফের মডেল অনুসারে এই শব্দ দুটি শব্দকোষে থাকবে না, কারণ শব্দগঠন সূত্র দিয়ে এ শব্দগুলো গঠন করা যায়। 'শত্রুত্ব' শব্দটি জ্যাকেন্ডফের শব্দকোষে নেই। আরোনফের মডেল অনুসারে শব্দটি শব্দকোষে থাকার প্রয়োজন নেই কারণ যে সূত্র দিয়ে 'বন্ধু' শব্দ থেকে 'বন্ধুত্ব' শব্দটি গঠিত হয় সেই একই সূত্র দিয়ে 'শত্রু' শব্দ থেকে 'শত্রুত্ব' গঠিত হতে পারে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে শব্দটি কখনও বাক্যে ব্যবহার করা হয় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আরোনফ বলছেন, শব্দকোষে Blocking বলে একটি নিয়ম আছে যাকে আমরা বাংলা বলতে পারি 'সংবরণ'। যদি কোন শব্দগঠন সূত্র এমন কোন শব্দ গঠন করে যার সমার্থ (এবং বহু ব্যবহৃত) একটি প্রতিশব্দ আগে থেকেই শব্দকোষে রয়েছে তবে শব্দগঠন সূত্র দ্বারা গঠিত নতুন শব্দটি 'সংবরিত' (Blocked) হয়। বাংলা শব্দকোষে 'শত্রুতা' শব্দটা আছে বলেই 'শত্রুত্ব' সংবরিত হলো। এখন প্রশ্ন হতে পারে, *'প্রস্থিত' শব্দেরতো কোন সমার্থ শব্দ নেই, তবে কেন *'প্রস্থিত' বাক্যে ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয় প্রশ্ন: 'বন্ধুত্ব' শব্দ বাংলা শব্দকোষে থাকা সত্ত্বেও কেমন করে কবীর সুমন 'বন্ধুতা' শব্দটি গঠন করলেন? দেখা যাচ্ছে, 'সংবরণ' এর সংস্কারটির (Notion) কিছু সমস্যা আছে।

লীবার (১৯৯২) এর মতে বিশ্লেষণ করা যায় না এমন সব মৌলিক শব্দতো শব্দকোষে আছেই, এছাড়াও আছে প্রাতিপাদিক, অঙ্গ, ধাতু, প্রত্যয়, উপসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি। যদিও অঙ্গ, ধাতু, প্রত্যয়... এ সবই শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত তবুও লিবারের তত্ত্বে অঙ্গ আর ধাতুর সাথে প্রত্যয়ের কিছু পার্থক্য রয়েছে। অঙ্গ বা ধাতুগুলো কোন পদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এই উপাদানগুলোর কোন উপপদীয় বৈশিষ্ট্যও নেই। প্রত্যয়গুলো বিভিন্ন পদশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন 'বন্ধুত্ব' এর {ত্ব} হচ্ছে বিশেষ্য আর 'বিপদগ্রস্ত' এর {গ্রস্ত} হচ্ছে বিশেষণ। এছাড়া প্রত্যয়গুলো কিছু উপপদীয় বৈশিষ্ট্যেরও অধিকারী। এই সব বৈশিষ্ট্য অনুসারে নির্ধারিত হয় প্রত্যয়গুলো কোন কোন প্রাতিপাদিক, ধাতু বা অঙ্গের সাথে যুক্ত হবে। লিবার এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন: 'নির্বাচন' (Selection)। যেমন, কোন ক্রিয়ামূল বা ধাতু {ই} বিভক্তি দ্বারা নির্বাচিত হবে (√কর+ই) অথবা {ত্ব} বা {গ্রস্ত} ইত্যাদি প্রত্যয় নির্বাচন করবে কোন

বিশেষ্যকে ('বন্ধু+ত্ব' ও 'চিন্তা+গ্রস্ত')। শব্দকোষে প্রত্যয়গুলোর একাধিক সহরূপমূল থাকতে পারে। যেমন, {তা} ও {অতা} পরস্পরের প্রত্যয় সহরূপমূল। প্রাতিপাদিক যদি স্বরান্ত হয় (যেমন, 'শত্রু') তবে যুক্ত হবে {তা} (শত্রুতা) আর ব্যঞ্জনান্ত হলে (যেমন 'দুর্বল') যুক্ত হবে {অতা} (দুর্বলতা)।

এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে প্রাতিপাদিকের ধ্বনিতাত্ত্বিক কাঠামো নির্ধারণ করছে কোন সহরূপমূলটি কোন প্রাতিপাদিকের সাথে যুক্ত হবে। রূপমূল নির্বাচন হতে পাওে বৈয়াকরণিক ভিত্তিতে। যেমন, বাংলায় সম্বন্ধ পদের বিভক্তির তিনটি সহরূপমূল রয়েছে :{র}, {এর} এবং {দের}। প্রথম দুটি বেছে নেবে একবচন বিশেষ্য (উদাহরণ: 'বন্ধুর', 'শামীমের') আর দ্বিতীয়টি বেছে নেবে বহুবচন বিশেষ্য (উদাহরণ: 'সালমাদের', 'শামীমদের', 'ছাত্রদের')। রূপমূল নির্বাচন হতে পারে একান্তভাবে আভিধানিক (Lexical) ভিত্তিতে। যেমন তৃতীয় পুরুষ সর্বনাম 'সে'র একটি সহরূপমূল রয়েছে {তা}। উদাহরণ 'তার' এবং 'তাদের'। *'সের' বা *'তারার' শব্দ মান বাংলায় গ্রহণযোগ্য নয়। এর মানে হচ্ছে {র} বিভক্তি প্রাতিপাদিক 'সে'-কে বেছে নিতে পারবে না, অঙ্গ {তা}-কে বেছে নিতে হবে। প্রাতিপাদিক ও অঙ্গের পার্থক্য এখানে লক্ষ্যণীয়। প্রাতিপাদিক পূর্ণ শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, অঙ্গ সব ক্ষেত্রে তা পারে না। অন্য ভাবে বলা যায়, সব প্রাতিপাদিকই অঙ্গ, কিন্তু সব অঙ্গ প্রাতিপাদিক নয়।

কিপারস্কি (১৯৯৬) মডেল অনুসারে বাংলা শব্দকোষে থাকবে {সন্ত্রস} ও {সন্ত্রাশ} (শেষ অক্ষরের উপধার (Coda) প্রণবটির উচ্চারণ তালব্য (Palatal) হবে)– এই দুটি রূপ (Morph)। লক্ষ্য করুন, রূপমূল (Morpheme) নয়, রূপ। কিপারস্কির মতে 'রূপমূল' শব্দটি অপ্রয়োজনীয় তবে কেউ যদি চান তবে 'বিভিন্ন রূপের সমষ্টি' অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার করতে পারেন। একদিকে {সন্ত্রস}('স' এর দন্ত্য উচ্চারণ অপরিহার্য) ও {সন্ত্রাশ}– এই দুটি প্রাতিপাদিক রূপ এবং অন্যদিকে {ত} এবং {ই} এই দুটি প্রত্যয় রূপ বাংলা শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত। {ত} প্রত্যয় বেছে নেয় {সন্ত্রস}-কে আর {ই} প্রত্যয় বেছে নেয় {সন্ত্রাশ}-কে। কিপারস্কি (১৯৮২ক) মডেলে প্রাতিপাদিকের সাথে 'সর্গ'(অর্থাৎ প্রত্যয়, উপসর্গ, বিভক্তি ইত্যাদি) যুক্ত হবার ব্যাপারটা অনুচক্রিক (Cyclic)। প্রতিটি সর্গ এক একটি চক্রের অন্তর্ভুক্ত। চক্রগুলোর একটি ক্রম রয়েছে: প্রথম চক্র, দ্বিতীয় চক্র, তৃতীয় চক্র ইত্যাদি। প্রথম চক্রভুক্ত সর্গগুলো প্রাতিপাদিক/ধাতু/অঙ্গের একেবারে নিকটে অবস্থান করবে। তার পর যুক্ত হয় দ্বিতীয় চক্রভুক্ত সর্গগুলো এবং তারও পরে আসে তৃতীয় চক্রের অন্তর্ভুক্ত সর্গগুলোর পালা। উদাহরণ: বাংলা শব্দ 'অভ্যস্ততা'। এখানে প্রাতিপাদিক 'অভ্যাস' এর সাথে দুটি সর্গ যুক্ত হয়েছে {ত} ও {তা}। {ত} প্রথম চক্রভুক্ত সর্গ এবং {তা} দ্বিতীয় চক্রভুক্ত সর্গ। {ত} আগে অভ্যাসের সাথে যুক্ত হবে এবং তার পর আসবে {তা} এর পালা। 'অভ্যস্ততা' বলা যাবে, '*অভ্যস্তাত' গ্রহণযোগ্য হবে না। এ যেন অনেকটা ট্র্যাফিক আইনের মতো। 'কার আগে কে যাবে' তা নির্ধারণ করবে রূপতত্ত্ব নামক ট্র্যাফিক পুলিশ। আরেকটি উদাহরণ দেয়া যাক: 'প্রভুত্বকামী'। এ শব্দেও আছে দুটি সর্গ {ত্ব} ও {কামী}। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে এই সর্গদুটির ক্রম বদলে *প্রভুকামীত্ব করা যায় না। প্রশ্ন হতে পারে 'অভ্যাশ' (বানান

উচ্চারণানুগ করার জন্যে তালব্য 'শ' ব্যবহার করা হলো) প্রাতিপাদিকের সাথে {ত} সর্গ যুক্ত হলেতো আমরা পাবো 'অভ্যাশত'। কিন্তু আমরা যে শব্দটা ব্যবহার করি সেটার উচ্চারণ হচ্ছে 'অভ্যস্ত'। এখানে অন্তত দুটি ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি আমরা: 'অভ্যাশ' এর 'আ' এর বদলে এসেছে 'অ' এবং তালব্য 'শ' এর পরিবর্তে এসেছে দন্তমূলীয় 'স'। এই দুটি পরিবর্তনকে ব্যাকরণ কিভাবে সামলাবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কিপারস্কি (১৯৮২খ) অনুসরণ করে বলা যায়: {ত} সর্গটি যুক্ত হবার সাথে সাথে দুই দুটি রূপধ্বনিতাত্ত্বিক (Morphophonological) নিয়ম কার্যকর হবে। একটি 'আ'-কে 'অ'-তে পরিণত করবে এবং অন্যটি 'শ'-কে 'স'-তে পরিণত করবে। উল্লেখ্য যে পাণিনির ব্যাকরণেও এ ধরণের রূপধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম রয়েছে।

ডি সিউল্লো এবং উইলিয়ামস (১৯৮৭) মনে করেন, শব্দকোষে যা যা আছে তার সবই শব্দ নয়। সেখানে শব্দ ছাড়াও বিভিন্ন রূপমূল আছে, বাগধারা-বাগবিধিগুলো আছে, কিছু কিছু বাক্যও আছে। শব্দকোষে এগুলো আছে কারণ এসব ভাষিক উপাদানের প্রত্যেকটিই 'প্রাতিস্বিক' (Idiosyncratic)। যেসব শব্দ শব্দকোষে আছে, সেগুলো আছে নিছক 'শব্দ' হবার কারণে নয়, বরং প্রাতিস্বিক হবার কারণে। যা কিছুরই 'প্রাতিস্বিকতা' আছে শব্দকোষে তার সবই থাকবে। আমরা উপরে দেখেছি, আরোনফও (১৯৭৩) মনে করেন সব আর্বিত্রিক ও অনিয়মিত শব্দ শব্দকোষের অংশ। এঁরা প্রায় সবাই সঞ্জননী ব্যাকরণ ঘরানার রূপতাত্ত্বিক এবং এঁদের মত অনেকটা সস্যুর, ব্লুমফিল্ড আর চমস্কি (১৯৬৫) এর মতোই: শব্দকোষ হচ্ছে যাবতীয় প্রাতিস্বিক উপাদানের আখড়া এবং এমন কিছুই এখানে নেই যা বৈয়াকরণদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে।

ফোর্ড ও অন্যান্য (১৯৯৭) প্রস্তাবিত অখণ্ড রূপতত্ত্ব অনুসারে শব্দকোষে শুধু শব্দ আছে, শব্দের চেয়ে ছোট কোন কিছু যেমন, ধাতু, অঙ্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি... এসব কিচ্ছু নেই শব্দকোষে, তবে শব্দের চেয়ে বড় কোন বস্তু যেমন, বাগধারা বা বাগবিধি থাকতে পারে। কিন্তু সব শব্দই কি শব্দকোষে থাকা অপরিহার্য? অখণ্ড রূপতত্ত্ব অনুসাওে কোন ভাষাভাষীর শব্দকোষে যদি অর্থগতভাবে সম্পর্কিত এবং একই রূপগত ও পদগত পার্থক্য প্রদর্শন করে (যেমন, বন্ধু/বন্ধুত্ব, মনুষ্য/মনুষ্যত্ব) এমন প্রয়োজনীয় সংখ্যক শব্দজোড় থাকে তবে সেই ভাষাভাষীর রূপতাত্ত্বিক উপাঙ্গে একটি রূপকৌশল (১১) অন্তর্ভুক্ত হবে। সবগুলো রূপকৌশলের অস্তিত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শব্দজোড় গঠন করতে যত শব্দ দরকার তার বেশি শব্দ শব্দকোষে থাকার প্রয়োজন নেই। যেসব শব্দ কোন রূপকৌশল দিয়ে গঠন করা সম্ভব নয় যেমন, 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' বা 'অঘটনঘটনপটিয়সী' সেগুলো শব্দকোষে থাকতেই হবে। কিন্তু 'বাজারে', 'ঘরে', 'উঠানে' ইত্যাদি শব্দের সবগুলো শব্দকোষে থাকার প্রয়োজন নেই কারণ শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত 'বাজার', 'ঘর', 'উঠান' ইত্যাদি শব্দ (১২) এর মতো রূপকৌশলে প্রক্ষেপ বা ম্যাপ করে ঐ শব্দগুলো গঠন করা যায়। 'শত্রুত্ব', 'প্রস্থিত' শব্দগুলো অনেকের শব্দকোষে নেই, কিন্তু (১১) ও (১৩) রূপকৌশল দিয়ে শব্দগুলো তৈরি করা সম্ভব।

(১১) $/XV/_{\text{বিশেষ্য}} \leftrightarrow /XVtto/_{\text{বিশেষ্য}}$

বন্ধু ↔ বন্ধুত্ব; মনুষ্য ↔ মনুষ্যত্ব; শত্রু ↔ শত্রুত্ব

(১২) /XC/$_{\text{বিশেষ্য, কর্তৃকারক}}$ ↔ /XCe/$_{\text{বিশেষ্য, অধিকরণ কারক}}$
বাজার ↔ বাজারে; উঠান ↔ উঠানে

(১৩) /Xan/$_{\text{বিশেষ্য}}$ ↔ /Xito/$_{\text{বিশেষণ}}$
অবস্থান ↔ অবস্থিত; প্রস্থান ↔ প্রস্থিত

হালে, জ্যাকেন্ডফ, আরোনফ, লিবার এঁরা সবাই 'শব্দকোষ' বলতে কোন ভাষার একটি মাত্র 'গণশব্দকোষ'-কে (The lexicon) নির্দেশ করছেন। কিন্তু ফেনোমেন বলছেন, কোন দুজন ব্যক্তির শব্দকোষ বা ভাষা এক হতে পারে না। কোন ভাষা যেমন, ইংরেজি বা বাংলার সম্পূর্ণ শব্দকোষ সঙ্কলন করা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। একজন বৈয়াকরণ বিশেষ একটি সময়ে বিশেষ একজন ব্যক্তির (বা খুব বেশি হলে বেশির ভাগ ভাষাভাষীর) ব্যাকরণ ও শব্দকোষের একটি আপাতসম্পূর্ণ বর্ণনা দেবার দাবি করতে পারেন মাত্র। শব্দকোষের শব্দগুলো আভিধানিক পৌনপুনিকতার সূত্র বা অনুরূপ কোন সূত্র দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ। শিশু যখন শব্দকোষ আয়ত্ত করতে থাকে তখন থেকেই এসব সূত্রের উদ্ভব হয় এবং এসব সূত্রের কারণে বেশির ভাগ শব্দ স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। আবার এই সূত্রগুলোর কারণেই কোন ভাষাভাষী তার শব্দকোষে নেই এমন সব শব্দ গঠন করতে পারে। সুতরাং শব্দকোষে যা যা আছে তাতো আছেই আবার যা যা নেই তাও আছে, কারণ যা নেই তা শব্দগঠন সূত্র দিয়ে গঠন কওে নেয়া সম্ভব । কত শব্দ থাকতে পারে একজন ব্যক্তির শব্দকোষে (হতে পারে পঞ্চাশ লক্ষ বা তারও বেশি)? – এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া কখনই সম্ভব নয় এবং ফেনোমেনের মতে এর কোন তাত্ত্বিক প্রয়োজনও নেই।

ফেনোমেনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কোন দুই জন বাংলাভাষী বা ফরাসিভাষীর শব্দকোষ এক হতে পারে না। বাংলাভাষীর সংখ্যা যদি কমবেশি ২৫ কোটি হয় তবে পৃথিবীতে ২৫ কোটি বাংলা শব্দকোষ আছে। আবার কোন বিশেষ একজন বাংলাভাষীর শব্দকোষও স্বতঃপরিবর্তনশীল। যে কোন ব্যক্তির সকালের শব্দকোষ আর বিকেলের শব্দকোষ ঠিক এক নাও হতে পারে, কারণ এই সময়ের মধ্যে যে নতুন কোন শব্দ তার শব্দকোষে অন্তর্ভুক্ত হবে না তার নিশ্চয়তা দেয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন, বর্তমান লেখকের ব্যক্তি শব্দকোষে 'আহোল' শব্দটি আছে যা অন্য অনেক বাংলাভাষীর শব্দকোষে সম্ভবত নেই, বাংলাভাষার অনেক অভিধানেও হয়তো নেই। 'আহোল' মানে 'এমন এক বোকা যে প্রতিটি জিনিষকে দু'টি করে দেখে'। যদি এমন হয় যে এ প্রবন্ধটি পড়ার আগে আপনি এ শব্দটি জানতেন না, এইমাত্র জানলেন, তবে তার মানে দাঁড়াবে এই যে এই বিশেষ মুহূর্তে আপনার শব্দকোষটি কিছুটা হলেও পরিবর্তিত হলো।

বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু 'শব্দকোষ' (Lexicon), 'অভিধান' (Dictionary) নয়। শব্দকোষ ও অভিধানের মধ্যে তফাৎ আছে। অভিধান বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর

নির্বাচিত কিছু শব্দের সংগ্রহ। কোন কোন শব্দ সেই সংগ্রহে থাকবে, অপশব্দ বা গালাগালিগুলো থাকবে কি থাকবে না, কারিগরী জগতের শব্দ বা উপভাষাগুলোর কোন শব্দ অভিধানে থাকবে কি থাকবে না তা অভিধান সঙ্কলকেরাই নির্ধারণ করে থাকেন। একজন ব্যক্তির শব্দকোষে বহু লক্ষ শব্দ আছে এবং আরও বহু লক্ষ শব্দ ব্যক্তি প্রয়োজনে তৈরি করে নিতে পারে। কোন অভিধান রচয়িতার পক্ষেই এত এত শব্দ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই রাজেন্দ্র সিংহ (২০০১:৪৭৬) বলেন: "এমনটি কখনো বলবেন না যে অমুক শব্দটি শব্দকোষে নেই। বরং বলুন, কার শব্দকোষের কথা বলছেন!" প্রশ্ন হতে পারে: প্রত্যেকের যদি আলাদা আলাদা শব্দকোষই হবে তাহলে কিভাবে এক বাংলাভাষী অন্য বাংলাভাষীর কথা বুঝতে পারে? বুঝতে পারে এই জন্যে যে যে কোন দুই জন বাংলাভাষীর শব্দকোষে বেশ কিছু সাধারণ (Common) শব্দ আছে। ২৫ কোটি বাংলাভাষীর শব্দকোষেও কিছু সাধারণ শব্দ আছে। এই সাধারণ শব্দগুলোর কারণেই দুই বাংলাভাষী বা সব বাংলাভাষী একে অপরের সাথে ভাববিনিময় করতে পারে। কেউ জিগ্যেস করতে পারেন: ২৫ কোটি শব্দকোষ এক সঙ্গে জোড়া দিলে যা দাঁড়াবে তাকে কি বাংলা শব্দকোষ বলা যাবে না? অবশ্যই বলা যাবে এবং ২৫ কোটি শব্দকোষ যদি জোড়া দেয়া যায় তবে তার সমষ্টি হবে তথাকথিত বাংলা **সামাজিক শব্দকোষ** (Social lexicon)। কিন্তু ২৫ কোটি বাংলাভাষীর স্বতপরিবর্তনশীল শব্দকোষকে জোড়া দেবার কাজটি অকল্পনীয়– মহাবিশ্বের চতুঃসীমা কল্পনা করার মতোই অসম্ভব একটি ব্যাপার। বাংলা শুধু নয়, পৃথিবীর কোন ভাষার বৃহত্তম অভিধানটিও সেই ভাষাভাষীদের শব্দকোষের সব শব্দকে ধারণ করে না, করতে পারে না।

উপরের আলোচনায় আমরা রূপতত্ত্বেও বেশ কয়েকটি মডেলের আলোকে ব্যক্তি-শব্দকোষে (Mental lexicon) কি কি আছে তার বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি। আমরা মনে করি, শব্দকোষে যাবতীয় প্রাতিস্বিক (Idiosyncratic) ও আর্বিত্রিক (Arbitrary) শব্দ থাকবে। তবে কোন শব্দ যদি রূপতাত্ত্বিক নিয়ম (তা সে যে কোন মডেলের নিয়মই হোক না কেন) ব্যবহার করে গঠন করা যায় তবে সে শব্দটি শব্দকোষে না থাকলেও চলবে। কিন্তু এমন কিছু শব্দজোড় শব্দকোষে থাকতেই হবে যেগুলোর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রূপকৌশল সৃষ্টি হতে পারে। এই শব্দজোড়গুলো ব্যক্তিভেদে আলাদা আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক, অর্থাৎ একই রূপকৌশল ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শব্দজোড় দ্বারা সমর্থিত হবে। আমরা আরও মনে করি, প্রতিটি বাংলাভাষীর একটি বাংলা শব্দকোষ আছে এবং সব বাংলাভাষীর শব্দকোষে বেশ কিছু সাধারণ শব্দ আছে এবং এই সাধারণ শব্দগুলোর কারণে এক বাংলাভাষীর বক্তব্য অন্য বাংলাভাষীর কাছে বোধগম্য থাকে।

টীকা:

১. Bloomfield 1984 [1933]:274 "The lexicon is really an appendix of the grammar, a list of basic irregularities."

২. Halle (1973: 6) “I am proposing that the list of morpheme together with the rules of word formation define the set of *potential* words of that language. It is the filter and the information that is contained therein with turn this larger set into the smaller subset of *actual* words. The set of actually occurring words will be called the *dictionary of the language*.

৩. Vennemann (1974:353) “we consider giving up the view that the lexicon contains roots of stems (and perhaps affixes) rather than words, and adopting the hypothesis that the lexicon contains words (and of course, items larger than words, such as idiomatic phrases and sentences), but no items below the complexity of words, in particular, no roots, stems, or affixes.”

নির্দেশিত রচনা

Aronoff, M. (1976) *Word formation in generative grammar*. MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

(1992) *Morphology now.* State University of New York Press, New York.

Bloomfield, L. (1984) *Language*, The University of Chicago press, Chicago & London. (Originally published in 1933).

Chomsky, N. (1957) Syntactic structures, Mouton, The Hague.

Chomsky, N. (1965) *Aspects of the theory of syntax*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

Chomsky, N. (1970) Remarks on Nominalization. In R.A. Jacobs and P.S. Rosenbaum (eds.) *Readings in English Transformational Grammar*, Waltham, MA:Ginn, 184-221.

Di Sciullo, M.and Williams, E. (1987) *On the definition of Word* (Linguistic Inquiry Monographs, 14). MIT Press, Cambridge, MA.

Ford, A., R. Singh and G. Martohardjono (1997) *Pace Panini, towards a word-based theory of morphology*. Peter Lang, New York.

Jackendoff, R. (1975) Morphological and semantic regularities in the lexicon. *Language* 51.639-71.

Halle, M. (1973) Prolegomena to a theory of word-formation, *Linguistic Inquiry* 4.3-16.

Kiparsky, P. (1982 ক) Word formation and the lexicon, In F. Ingemann (ed.) *Proceedings of the 1982 Mid-America linguistic conference*, University of Kansas, Lawrence, 3-22.

(1982খ) Lexical morphology and phonology. In I. S. Yang (ed.) *Linguistic in the morning calm: selected papers from SICOL-1981*, The Linguistic Society of Korea & Hanshin Publishing Co., Seoul, 3-91.

(1994) Allomorphy or morphophonology. In R. Singh (ed.) *Trubetzkoy’s orphan*, John Benjamin’s Publishing Company, Amsterdam,15-31.

Lieber, R. (1992) *Deconstructing Morphology: Word Formation in Syntactic Theory*. The University of Chicago press, Chicago/London.

Saussure, F. de (1988) *Cours de linguistique générale*, Editon Payot, Paris (Originally published in 1915).
Singh, R. (2001) On language and linguistics: an ardhasataka for Ulli Dressler, on his sixtieth birthday. In Schaner-Wolles et al. (eds.) *Naturally*. Rosenberg & Sellier, Torino,475-478.
Vennemann, T. (1974) Words and syllables in natural generative grammar. In A. Bruck et al. (eds.) *CLS Parasession on Natural Generative Phonology*, 346-374.